বিষাক্ত সুন্দর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

কব্জিতে স্টেনলেস স্টিলের বালা, গোঁফজুলফিওলা এমন একজন বিশাল আর কালো কুচকুচে লোকের সেবা করা উচিত হবে কিনা, পয়সা টস করে দেখার ব্যাপার নয়।

শরদীশ সাইকেল রিকশোটা ডাকতে গিয়ে ডাকে না। থমকে দাঁড়ায়। অর্জুন গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে থাকা লোকটাকে সে প্রথমে মাতাল ভেবেছিল, পরে দেখে, পেট চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

খুব সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট পরে থাকলেও লোকটাকে তার সাধারণ মনে হয় না। অথচ কেউ ওর দিকে তাকিয়েও দেখল না, রাস্তা ধরে স্টেশন থেকে চলে গেল কিংবা স্টেশনের দিকে এল। আপ ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের শব্দ তখনও দূরে উত্তরে সন্ধ্যার ঘোরলাগা দিগন্ত থেকে আবছা শোনা যাচ্ছে। মাঝারি স্টেশন। উঁচু চত্বরের ধূসর ডোরাকাটা ও একটানা লম্বা বেড়ার ওপাশে কিছু সিল্যুট-সিল্যুট শক্ত মূর্তি চোখে পড়ছে। তারা প্রতীক্ষা করছে ডাউন ট্রেনের। ধাপের নিচের চত্বরটা এখন ফাঁকা।

সাইকেল-রিকশো, ঘোড়ার গাড়ি, লরি, টেম্পো, বাস, মানুষজন—যা কিছু এতক্ষণ হল্লা করছিল, সব একে একে উধাও হয়ে গেছে। নিচে একপাশে গোটা তিনেক ছোট্ট দোকান—চা সন্দেশ আর পান-বিড়ি-সিগ্রেটের। সেখানে দু-চার জন লোক উদাস হয়ে বসে আছে। বেঞ্চের উপর একটা ডেলাইট কাত করে রেখে একটা লোক রীতিমত কুস্তি লড়ে যাচ্ছে। এখানে বিদ্যুৎ নেই। তাই কলকাতা থেকে কয়েকপুরুষ যাবৎ সভ্যতা আসি-আসি করে কথা দিয়েও এসে পড়েনি। আশেপাশে এখনও ভয়হীন কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত গাছপালা ঝোপঝাড় পোকামাকড় ও কয়েক জাতের জন্তুর সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী টিকে থাকতে পেরেছে। এখনও কোথাও কঠিন সিমেন্ট বা করোগেট শিটের দেওয়ালের ওপর এগিয়ে আসে সতর্ক কয়েকটা ঘাসের আঙুল ; ভীতু গাছের একটুখানি ঝুঁকে উঁকি মেরে চুপি চুপি দেখতে আসা কৌতূহলী প্রতিবেশী বউটির মুখের মতন, কোথাও চলন্ত বাসের পিঠ ছুঁয়ে দেয় হলদে আদিম একটু হাসির মতন কিছু ফুল।

কলকাতা থেকে দেড়শো মাইল নাক-বরাবর উত্তরের এই স্টেশনে নেমেই একটা গন্ধ পেয়েছিল শরদীশ। চারপাশে তাকিয়ে ভেবেছিল, বাঃ বেশ তো!

কিন্তু রাস্তার ধারেই একটা অসুস্থ লোক!

বিদেশ বিভুঁয়ে গেলে শরদীশের সবসময় মনে এক আকাশ উদারতা নিয়ে ঘুরতে ভালো লাগে। সব অচেনা মানুষকেই 'এই যে ভাই! কেমন—কী খবর?' বলতে ও কুশলপ্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে।

তবে সেজন্যও নয়, গতরাতে শুতে যাবার আগে সে মনে মনে ঠিক করেছিল, আগামীকাল কোন না কোন একটা ভালো বা মহৎ কাজ সে করবেই। কারণ, তার ধারণা—এ যাবৎ একটাও মহৎ কাজ সে করেনি। শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি বই পড়েছে, চা গিলেছে, সিগ্রেট টেনেছে, আর আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে।

শরদীশ লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়। ও তাকে দেখছে না। মুখ নামিয়ে শার্টের ভেতর দিয়ে পেটে হাত চেপে ককাচ্ছে। ময়লা প্যান্টে ঢাকা পা টান টান হয়ে ছড়ানো আছে। পায়ে বেরঙ বেঢপ কাবুলী চপ্পল। বকলেসগুলোও জং-ধরা। এতক্ষণে চোখে পড়ে, ওর কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগও রয়েছে। ব্যাগটা কীসব জিনিসপত্রে ঠাসা। পিঠের দিকে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। কিছু পড়ে গিয়ে থাকলেও ওর দেখার সময় নেই।

শরদীশ ভাবে, এই লোকটার সেবা করা কি সেই প্রতিশ্রুত মহৎ কাজের পর্যায়ে পড়বে? অবশ্য সে গান্ধীজী বা বিদ্যাসাগর নয় যে আগামী যুগের বালক-বালিকারা রাত জেগে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সেই কাহিনী মুখস্থ করবে। কিংবা মহৎ কাজ হিসেবে গণ্য করে খবরের কাগজেও কিছু লেখা হবে, যা সকালবেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ চোখ বুলিয়ে দেখে ভাববে যে 'এখনও মহৎ মানুষেরা মরেন নি'—এমন চান্স কি তার আছে? কথা হচ্ছে, এই প্রাগৈতিহাসিক অঞ্চলের (অন্তত যা শুনেছে বা টের পাচ্ছে) সবুজ অন্ধকার ঢুঁড়ে তাকে বের করতে পারবেন কোন নিজস্ব সংবাদদাতা?

শরদীশ টের পায়, আসলে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বর কারণ আর কিছু নয়, নিছক কৌতূহল। কব্জিতে স্টেনলেস স্টিলের বালা, গোঁফজুলফিওলা কালো কুচকুচে লোকটার মধ্যে একটা কিছু আছে, যা তাকে আকর্ষণ করছে। হুঁ, সেটা ওর স্বাস্থ্য, ওর শারীরিক আয়তন হতেও পারে। তাছাড়া আপাতদৃষ্টে এমনই হবে না যে ওর কোন অসুখ-বিসুখ আছে। অথচ বড্ড কাবু হয়ে পড়েছে বেচারা। হয়তো উঠে দাঁড়াবার কিংবা রিকশো ডাকবার শক্তি অবশিষ্ট নেই। এদিকে আর একটু পরেই হু-হু করে রাত এসে পড়বে। তখন অন্ধকারে ও নিশ্চয় আরও কষ্ট পাবে। লোকগুলোকেও এখানে কেমন নির্বিকার মনে হয়েছে শরদীশের। কেউ ওর দিকে এগোনো দূরের কথা, শুনে যেন তাকিয়েও দেখল না!

শহর হলে অবাক লাগত না। এ যে অজ পাড়াগাঁ, এখানেও কি মানুষ শহরের মতন লাশ পড়ে থাকতে দেখেও পাশে বেগুন কেনার জন্যে দরাদরি করে?

তার বিস্ময়টা এতক্ষণে বাড়ে। কৌতূহলও তার ফলে বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে গতরাতের মহৎ কাজের প্রতিশ্রুতি যাত্রাদলের বিবেকের মতন চেরা গলায় যেন সাজঘরের দরজা থেকেই গান গাইতে গাইতে প্রকাশ্য আসরে এগিয়ে আসতে থাকে।

শরদীশ যখন লোকটার কাছে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বলে—'এই যে দাদা, শুনছেন?' ঠিক তখনই পশ্চিমে উঁচুতে স্টেশনের ওদিকে ধূ-ধূ গ্রীষ্মের মাঠ থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গেল। এদিকে ঘনিয়ে উঠল খুব পুরনো ধরনের একটা আবছায়া। সামান্য দূরে দোকানগুলোর একটায়

প্রথম আলো জ্বলল। আর একটা রিকশো উদাস বিষণ্ন চাপা আওয়াজ নিয়ে পিঠের দিকে দাঁড়াল এবং রিকশোওলা যেন ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল স্বরে আস্তে বলে উঠল—'আসুন সার, নিয়ে যাই।'

শরদীশ মুখ ঘুরিয়ে রিকশোওলার উদ্দেশে বলে—'এক মিনিট।' আর সে লক্ষ্য করে, রিকশোওলার মুখ ভুরু চোখ ও ঠোঁটে কী যেন নিঃশব্দ বিপদ-সংকেত চনচন করছে। শরদীশ একটু চমকে ওঠে। ও কি তাকে চলে আসতে বলছে এই অসুস্থ লোকটাকে ফেলে? কেন?

সে লোকটার কাঁধে হাত রাখে।—'ও দাদা শুনছেন? কী হয়েছে আপনার? পেটব্যথা করছে? এই যে শুনছেন?'

লোকটা এবার মুখ তোলে—যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। ভয়ঙ্কর মনে হয় শরদীশের। কিন্তু অনেক কষ্টে সে ফিস ফিস করে বলে ওঠে—'তকিপুর যাব, তকিপুর! এই রাস্তার ধারে—প্লীজ!'

কথার ভঙ্গীতে শরদীশ টের পায় লোকটা একজন 'ভদ্রলোক'। তবে সেজন্যেও নয়, সে ওকে সাহায্য করবে বলেই যখন পা বাড়িয়েছে, তখন আর কিছু বিচার করা অবান্তর। সে সহানুভূতি প্রকাশ করে গলায়—'আপনার কী হচ্ছে? পেটব্যথা?'

মাথা দোলায় লোকটা। ফিস ফিস করে বলে—'হঠাৎ আজই। ট্রেন থেকে নেমেই। কেন হল—কেন? প্লীজ আমাকে...' কথাটা শেষ করতে পারে না সে। আবার পেট খামচে ধরে ককিয়ে ওঠে।

শরদীশ উঠে দাঁড়ায়। রিকশোওলাকে বলে—'ওহে, কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানা বা হাসপাতাল নেই?'

রিকশোওলার মুখে সেই অদ্ভুত ভাবটা তখনও দেখা যাচ্ছিল। সে জবাব দেয়—'সে সার এখানে কোথায়? ফতেখাঁর দিয়াড় আছে—সেখানে। কমপক্ষে সাত মাইল পথ।'

'আরে! আমি তো ফতেখাঁর দিয়াড়েই যাব।' শরদীশ উৎসাহী হয়ে বলে।

রিকশোওলা বেজার হয়ে পড়ে।—'বাসে গেলেন না কেন? রিকশোয় সার অনেক বেশি লেগে যাবে! তাতে আঁধার রাত। কেউ যেতেই চাইবে না, দেখবেন।'

শরদীশ চটে ওঠে।—'তুমি যাবে কিনা বলো তো বাবা!'

ঘাড় নাড়ে সে।—'যাব। সাত টাকা লাগবে।'

'সাত টাকা!' শরদীশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। অন্ধকার একটু একটু করে রিকশোওলার মুখের রেখা মুছে দিচ্ছে। কালো এক পাষাণমূর্তি বসে আছে সিটে। চাকা একটু গড়াল সেই সময়। রিকশোওলা বড় বড় করে বলল—'ন্যায্য দর, সার। যাচাই করুন।'

শরদীশ প্রায় কাতর হয়ে বলে—'দাঁড়াও, দাঁড়াও। গরজটা কি একা আমার—না তোমারও? কথা শোন—আমি নতুন লোক এখানে। ঠকানো কি ভাল হচ্ছে?'

নির্বিকার জবাব আসে—'বাসে গেলেন না কেন সার? চল্লিশ পয়সাতেই হত।'

ইস্! পাড়াগাঁ বলতে যে সরলতা আর ভাল ভাল মানবিক গুণের ভাণ্ডার বলে মনে করা

হয়, তা যে কী ভুল এবং কত ভুল শরদীশ এবার হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। বেছে বেছে শহরের সেরা খারাপ জিনিসগুলোই যেন গাঁয়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছে! আরে বাবা, বাসে গেল না কেন, তুমি কী করে বুঝবে? কলকাতার অমন ভিড়েও শরদীশ দিব্যি ঝুলতে ঝুলতে যেতে পারে—কিন্তু এখানে যা দেখল, তা রীতিমত বিস্ময়কর। একটামাত্র বাসের মধ্যে চোখের পলকে যেন কয়েক শো মানুষ গস্ত হয়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতে পাদানী, বনেট, পিছন, ওপর, জানালার ধার—সবখানে আরও কয়েক শো বোঝাই হল। প্রত্যক্ষ না দেখলে দূর মফঃস্বলে বাসের এই দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। সে এক ম্যাজিক বললে ভুল হয় না।

তারপর বাদবাকি যাত্রীরা গতিক বুঝে লরি টেম্পো রিকশো ঘোড়ার গাড়ি যা পেল সামনে হুড়মুড় করে দখল করে ফেলল। অসহায় শরদীশ হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছে শুধু।

একটা রিকশো অবশ্যি উল্টোদিক থেকে খালি আসছিল, শরদীশ তাকে ডাকতে গিয়েও ডাকে নি—কারণ এই অসুস্থ লোকটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু নির্ঘাৎ সেটা তখুনি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্যি এই আর একটা খালি রিকশো কোত্থেকে এসে গেছে। তবে, এখন কিছুক্ষণ অন্তত রিকশো মিলবে বোঝা যায়। ডাউন ট্রেনের জন্যে যাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। বাসটাও ফের যাত্রী নিতে আসবে। তখন শরদীশ ফাঁক পেয়ে আগে-ভাগে একটা সিট দখল করতে পারে।

কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। এই অসুস্থ লোকটাকে সে ফেলে যাবে না। ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিলেও অন্তত নিজের বিবেকের নিন্দা থেকে বাঁচা যাবে। শরদীশ ক্রমশ ভেতরে চটে উঠছিল। রিকশোওলার পরামর্শ শুনে তার মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টে খোঁচাও লেগেছে। সে জেদ করে বলল—'নাও বাবা, তোমাদের রাজ্যে পড়ে গেছি। যা খুশি করো।'

রিকশোওলা কিন্তু তখুনি রাজী হয়ে গেল না।—'ফতেখাঁর দিয়াড়ে ঠিক কোনখানে যাবেন সার?'

'যা বাবা!' শরদীশ ভারি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। 'মণীন্দ্র ঘোষের ওখানে যাব। বলছি তো নতুন যাচ্ছি।'

রিকশো ঘুরিয়ে রিকশোওলা বলে—'একা যাবেন, না দুজনে?'

শরদীশ চেঁচিয়ে বলে—'দুজনে—দুজনে! পথে এই ভদ্রলোককে—কোথায় বললেন—সেখানে নামিয়ে দিয়ে যাব।' তারপর অসুস্থ লোকটার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করে 'নাকি আপনি সোজা হসপিটালে যাবেন? সেই তো ভাল হত। কী বলেন?'

লোকটা মাথা দোলায়। তারপর ব্যাগটা সামলে নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। শরদীশ তাকে ধরে ওঠায়। সে রিকশোর দিকে অনেক কষ্টে পা বাড়িয়ে বলে—'কী রে পল্টে, চিনতে পারছিস নে? তাই হয় রে! হীরু বোসকে আর এখন কেউ চিনতে পারবে না!'

রিকশোওলা এবার লাফিয়ে ওঠে।—'আরে! কী কাণ্ড! হায় ভগবান! আমি এ বয়সেই চোখের মাথা খেয়েছি নাকি! বাবু এলেন তাহলে! ওরে বাবা, কতদিন পরে—চিনব কেমন করে? ছাড়া পেলেন বাবু? হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি ধরছি— উঠুন, উঠুন! ওরে বাবা—'

হীরু বোস ওর হাত ছাড়িয়ে 'থাক্' বলে শরদীশের কাঁধ আঁকড়ে ধরল। তারপর রিকশোয় উঠে হেলান দিল। অস্ফুট ককায় সে।

শরদীশ অবাক হয়েছিল। কী যেন ঘটনা আছে হীরুবাবুর পিছনে। রিকশোওলা এখন খুব হই-চই করার তালে আছে। বক বক করে কী সব বলছে—সেগুলো এই লোকটার সম্পর্কে এবং খুবই সহানুভূতি-সূচক বাক্য।... 'ছি, ছি, ছি! কী কাণ্ড দেখুন তো দাদাবাবু! আরে, আজই তো আপনার বোনের সঙ্গে দেখা হল—তখন তো উনি কিছু বললেন না। হঠাৎ ছাড়া পেলেন বুঝি?'

শরদীশ বলে—'একটু তাড়াতাড়ি এগোও বাবা।'

রিকশোটা সন্ধ্যার আবছায়া থেকে ক্রমশ আদিম ধরনের অন্ধকারে ঢুকে যেতে থাকে। হীরু বোসের কাঁধটা ধরে শরদীশ বসে থাকে চুপচাপ। লোকটার সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। আরও কষ্ট পাবে।

পিচের পথটা জায়গায় জায়গায় ভেঙেচুরে রয়েছে। রিকশোওলা সামনে ঝুঁকে প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে শ্বাসকষ্টসমেত বলতে থাকে—'সাতবচ্ছর! বুঝলেন সার? দাদাবাবুর সাতবচ্ছর পরে মুখ দেখলুম। মাঝে মাঝে খবর না নিয়েছি, এমন নয়। ওনার বোন আমাকে খুব সেনেহ করেন কি না। তা—একথাটা তো বলেন নি। বুঝলেন সার? দিন যায়—কথা থাকে। দাদাবাবুরও দিন গেল—কিন্তু কথা থাকল! সেই তো একের পাপে অন্যের খোয়ার হল—কিন্তু বিধির বিচার খণ্ডায় কে? নিচের জজ বললে—যাও, তোমাকে সাতবছর দণ্ড দিলুম। তো ওপরকার জজ বললেন—কী? লিদুরীর ছাস্তি? থাম্ তবে।... বুঝলেন সার? বছর ঘুরতে না ঘুরতে তার ফল ফলে গেল। হ্যাঁঃ, ফলে গেল ফল!'

রিকশোওলা যে মনের কথা বলছে না এবং বানিয়েই সব বলছে, তা বুঝতে দেরি হয় না শরদীশের। সে কোন প্রশ্ন করে না তাই। অথচ ভারি কৌতূহল হয়—কে এই সাড়ে ছ'ফুট উঁচু বিশাল দৈত্যমানুষ হীরু বোস? কেন তার সাতবছর জেল হয়েছিল? সে ডানহাত ওর কাঁধের ওপর রেখে ধরে থাকে ওকে। ও মাঝে মাঝে অস্ফুট ককিয়ে ওঠে। শরদীশ আস্তে শুধোয়—'জল খাবেন—জল?' খেতে চাইলেও এখন জল কোথায় পাবে সে জানে না। কিন্তু হীরু বোস বলে—'নাঃ নাঃ।' এসব সময় পেট কামড়ানির ট্যাবলেট থাকলে কত কাজ দিত! আজকাল অনেকের বাতিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম ট্যাবলেট নিয়ে ঘোরে। শরদীশের নেই। অত হিসেবী ছেলেও সে নয়। তাহলে তো কবে...

থাক্ গে। এসব ভেবে চিন্তে লাভ নেই। ডিগ্রি মেধা এসব কাগজ কলমে যাই অর্জন করা যাক, আজকাল এদেশে কাজে লাগানো কঠিন। লক্ষ লক্ষ বেকার হন্যে হয়ে ঘুরছে। শরদীশ এমন কিছু ভাগ্য করে আসে নি।

উঁহু, এও বলতে হয় ভাগ্যের ব্যাপার। তা না হলে হঠাৎ এক বিস্মৃত দূরবর্তী আত্মীয় মণীন্দ্র ঘোষ হঠাৎ চিঠি লিখে তাকে আসতে বলবেন কেন ফতেখাঁর দিয়াড়? চাকরি কিনা